بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং জামাতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে সবসময় এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী হবার দাবি করে বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে আমরা যেন খতমে নবুয়্যতকে অস্বীকার করেছি। অথচ আমরা জানি যে, এটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা আর আমাদের বিরুদ্ধে একটি অপবাদ। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুসারেই মুহাম্মদ (সা.)-এর খতমে নবুয়্যতে তাদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী এবং একে কাজে রূপায়নকারী আর আমাদের হৃদয়কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমে পরিপূর্ণকারী এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রচারকারী, যতটা না মুসলমানদের অন্যান্য ফিরকা তা প্রকাশ করে বা মানে। বরং সত্যিকার অর্থে অন্যান্য মুসলমানরা মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও বোঝে নি যতটা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার কারণে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীরা তা অনুধাবন করে। যাহোক, খতমে নবুয়্যতকে ভিত্তি করে অন্যান্য মুসলমানরা সবসময় আহমদীদের বিরোধিতা করে আসছে আর বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে এক্ষেত্রে উত্তেজনা অনেক বেড়ে যায় বা নামধারী বিভিন্ন আলেম এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি গ্লাসগো'তে যে আহমদীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে এর ভিত্তিতে বিরোধিরা আত্মরক্ষার জন্য একে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির নামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রচার মাধ্যমের সীমাহীন আগ্রহের কল্যাণে এরা বাহ্যতঃ কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনা-সূলভ মনোভাব প্রকাশ করেছে। মুসলমানদের অনেক সংগঠন বরং মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠনের এই মনোবৃত্তিই ছিল। কিন্তু একই সাথে তারা এই হঠকারিতারও বহিঃপ্রকাশ করে যে, আহমদীরা অবশ্যই মুসলমান নয়। তাদের মসজিদগুলোতে একথা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর জনসাধারণের হৃদয়ে এই বিষয়ে এরা এতটাই বিষোদগার করেছে যে, মুসলমানদের সন্তান-সন্ততি যাদের হয়তো কলেমাও ভালোভাবে জানা নেই, যারা হয়তো জানেই না যে, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে, তারা স্কুলে আহমদী ছেলে-মেয়েদের বলে যে, তোমরা মুসলমান নও। কোন কোন ছেলে-মেয়ে সম্প্রতি আমাকে লিখেছে, আমাদের সাথে স্কুলে এরূপ ব্যবহার করা হয়। আমি তাদের এটিই বলি যে, পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামের কথা শিখুন, বন্ধুদেরকে বা সাথীদের বলুন যে, আমরা মুসলমান আর ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি। রসূলে করীম(সা.)-কে আমরা খাতামান্নাবিঈন মানি। আর তিনি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই আগমনকারী মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাস এবং অধিনস্ত নবী মানি। যাহোক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের বিরুদ্ধে কিছুদিন পরপরই এই

উত্তেজনা মাথা চাড়া দেয় আর এখন যেহেতু প্রচার মাধ্যম এবং যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার কারণে বিরোধী এবং বিরোধিতা সর্বত্র পৌঁছে যায়। তাই পৃথিবীর কোন দেশই এখন নৈরাজ্যবাদী ও নামধারী মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এখন এরা আফ্রিকায়ও পৌঁছে যায় যেখানে এরা পূর্বে কখনো যায় নি, আর যে অঞ্চলের মানুষ ছিল বিধর্মী বা খ্রিষ্টান বা মুসলমান থাকলেও নামে মাত্র সেখানে গিয়ে আহমদীরা যখন জামাত প্রতিষ্ঠা করে ও মসজিদ নির্মাণ করে তখন এমন স্থানেও এরা পৌঁছে যায় আর গিয়ে বলে, আহমদীরা মুসলমান নয়। যাহোক, এই হলো তাদের আক্রমন আর এই হলো তাদের অস্ত্র যা তারা ব্যবহার করে। আর একই কারণে ইউরোপেও তারা পৌঁছে আর মসজিদ, মাদ্রাসা বা ঘরে তারা যে শিক্ষা দেয় এসব কারণে তাদের সন্তান-সন্ততির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং তাদের মন-মস্তিষ্ককে বিষিয়ে তুলছে কিন্তু যেসব স্থানে তারা পৌঁছে সেখানে আমাদের সব আহমদী ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য আবশ্যক হবে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরী জ্ঞান অর্জন করা। সে শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন আর যার ওপর আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার শেষ শরীয়তধারী নবী, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ এখন আর নতুন কোন শরীয়ত নাযিল হতে পারে না আর পবিত্র কুরআন সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে ও আনুগত্যে এসেছেন এবং তিনি তাঁর দাস ও অনুগত নবী এবং তাঁর শরীয়তকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী নবী। মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তকেই পৃথিবীতে প্রচার করা হলো তাঁর দায়িত্ব। যাহোক, জামাতের সাথে আমরা সব সময় আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার দেখেছি যে, যখনই বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এসব বিরোধিতা জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে সার হিসেবে কাজ করেছে। এটি নিয়ে আমরা কখনো চিন্তিত ছিলাম না, চিন্তিত নই এবং চিন্তা হওয়া উচিতও নয়। বর্তমান বিরোধিতার ফলেও প্রচার মাধ্যমের সুবাদে জামাত ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছে যা হয়তো এত স্বল্প সময়ে আমাদের জন্য করা সম্ভব ছিল না। এর কল্যাণে এখানে বা এই দেশেও এদিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অনেক আহমদী যুবক যারা ধর্মের প্রতি খুব একটা আগ্রহ রাখতো না, যাদের অনেকেরই জামাতের সাথে খুব একটা উঠাবসা ছিল না বা আসা যাওয়া হতো না, কেবল ঈদের সময় আসতো বা সম্পর্ক থাকলেও অনেক হালকা ছিল ,এখন প্রচার মাধ্যমের সুবাদে তারাও জানতে পেরেছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী মানি, কিন্তু তা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এবং আনুগত্যে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের দায়িত্ব কীভাবে পালন করেছেন আর খাতামান্নাবীঈন হিসেবে তিনি (সা.)-এর মর্যাদা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে আমাদের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন এ সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি আমি উপস্থাপন করবো। তিনি (আ.) বলেন,

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না আর মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী বলে গণ্য হতে পারে না যতক্ষণ সে মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন বলে বিশ্বাস না

করবে, এবং যতক্ষণ (মনগড়া) এসব নিত্য নতুন কথার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে অর্থাৎ এই যে, নতুন নতুন কথা, বিভিন্ন যিকির-আযকার, বিভিন্ন প্রকার বিদাত এবং নতুন কথার উদ্ভাবন যা মানুষ করেছে এগুলো থেকে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে না। এগুলোর সূচনা মসীহ্ মওউদ (আ.) করেন নি বরং বিভিন্ন আলেম ও মাশায়েখ এসবের সূচনা করেছে। তিনি (আ.) বলেন, **যতক্ষণ এগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে আর কথা এবং কর্মে তিনি (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন না মানবে ততক্ষণ সে কিছুই নয়।**

এগুলো কেবল মৌখিক দাবি নয় বরং কার্যতঃ মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন মানা আবশ্যক, যদি না মানে তাহলে তিনি (আ.) বলেছেন, **এমন ব্যক্তি অর্থহীন**। তিনি (আ.) বলেন, সাদী কতই না সুন্দর লিখেছেন,

অর্থাৎ, **"তাক্বওয়া এবং খোদাভীতি আর নিষ্ঠা ও সততার চেষ্টা অবশ্যই কর, কিন্তু মুস্তফা (সা.)-এর শিখানো রীতিকে লঙ্ঘন করে নয়।"**

তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যার বাস্তবায়নের জন্য খোদা তা'লা আমাদের হৃদয়ে আবেগ এবং প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তাহলো শুধু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়্যত প্রতিষ্ঠা করা যা আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর সকল মিথ্যা নবুয়্যতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যা এরা নিজেদের বিদআত বা নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সূচিত করেছে। নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়্যত থেকে এরা বিচ্যুত। সত্যিকার অর্থে এরাই খতমে নবুয়্যতের মোহর লঙ্ঘনকারী। এসব পীরদের গদী দেখ আর কার্যতঃ লক্ষ্য কর যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি নাকি এরা? খতমে নবুয়্যতের পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কেবল এটিই হবে এমনটি মনে করা অন্যায় এবং অবিচার যে, কেবল মুখে খাতামান্নাবিঈন মান আর কাজ তাই কর যা নিজেদের পছন্দমতো হয় আর নিজেদের এক পৃথক শরীয়ত আবিষ্কার কর। বাগদাদী নামায, মাকূস নামায ইত্যাদি কোন কোন মুসলমান দল আবিষ্কার করে রেখেছে।** তিনি (আ.) বলেন, **কুরআন শরীফ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শে এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি? অনুরূপভাবে 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শায়উল্লিল্লাহ্' বলার প্রমাণ কুরআনের কোন স্থানে আছে কি?** রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অস্তিত্বই ছিল না। **প্রশ্ন হলো কে এটি শিখিয়েছে? কিছুটা লজ্জিত হও, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ এবং শরীয়ত মেনে চলা কি একেই বলে? নিজেরাই সিদ্ধান্ত কর যে, এরূপ বিশ্বাস পোষণের পর কোন মুখে আমার ওপর এই অপবাদ আরোপ করছো যে, আমি খাতামান্নাবিঈনের মোহর লঙ্ঘন করেছি বা ভঙ্গ করেছি। আসল কথা এবং সত্য কথা হলো, যদি তোমরা তোমাদের মসজিদে বিদআতকে প্রবেশের অনুমতি না দিতে আর মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবিঈন (সা.)-এর সত্যিকার নবুয়্যতে ঈমান এনে তাঁর কর্মপন্থা এবং পদাঙ্ককে পথপ্রদর্শক হিসেবে শিরোধার্য করতে তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কী ছিল? তোমাদের এসব বিদআত এবং নিত্য নতুন নবুয়্যতই খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত হেনেছে যেন আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাদরে সজ্জিত করে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে পারেন যিনি মিথ্যা**

নবুয়্যতের প্রতিমাকে খন্ড বিখন্ড করে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। অতএব এসব কাজের জন্যই খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

তিনি (আ.) বলেন, **"গদিনশিনদের সিজদা করা বা তাদের বাড়ি-ঘরের তাওয়াফ করা সামান্য ব্যাপার। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে সৃষ্টি করেছেন মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত এবং সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এক ব্যক্তি, যে কারো প্রেমিক আখ্যায়িত হয়, তার মত যদি আরো সহস্র সহস্র প্রেমাস্পদ থাকে তাহলে তার প্রেম ও ভালোবাসার বিশেষত্ব বা স্বতন্ত্রতাই বা কী থাকলো?** অর্থাৎ একজনের প্রতি কারো ভালোবাসা থাকে, তার মতই যদি আরো সহস্র সহস্র মানুষ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে যাকে ভালবাসা হয় তার বিশেষত্বই বা কী থাকলো? **এদের দাবি অনুসারে এরা রসূলপ্রেমে বিভোর, প্রশ্ন হলো ব্যাপার কী, তারা সহস্র সহস্র মাজার এবং খানকারও পূজা করে? নিঃসন্দেহে এরা মদীনা শরীফ যায় কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য খানকা বা দরবারেও খালি মাথা এবং খালি পায়ে যায়, মুক্তির জন্য পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই যথেষ্ট মনে করে** (অর্থাৎ পাক-ভারতের বিভিন্ন জায়গা যেখানে এসব বুযূর্গদের জন্ম হয়েছে সেখানে তারা যায় এবং এরা তাদের কবর পূজা করে)। **এরা মনে করে, পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই মুক্তির জন্য যথেষ্ট অন্য কোন নেক সৎকর্মের প্রয়োজন নেই, কেবল এমনটি করলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ কোন পতাকা উড্ডীন করে রেখেছে। কেউ এক রূপ ধারণ করেছে আর কেউ ভিন্ন আকৃতি। এদের ওরশ এবং মেলা দেখে একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয় কেঁপে উঠে যে, এরা এসব কি আরম্ভ করেছে? যদি ইসলামের জন্য খোদার আত্মাভিমান কাজ না করতো আর** ' إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ' (সূরা আলে ইমরান: ২০) **যদি খোদার উক্তি না হতো আর তিনি যদি না বলতেন যে,** ' إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ' (সূরা আল্ হিজর: ১০) **তাহলে আজকে নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে এর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় কোন সন্দেহই আর বাকি থাকতো না। কিন্তু খোদার আত্মাভিমান কাজ করেছে, তাঁর করুণা এবং তাঁর হিফাযত করার প্রতিশ্রুতির দাবি ছিল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বুরূয বা প্রতিচ্ছবিকে নাযিল করা এবং এ যুগে তাঁর নবুয়্যতকে নতুনভাবে জীবিত করে দেখানো। তাই তিনি এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেন আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন।"**

এরপর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ প্রকাশ করা এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের নাম কথা প্রসঙ্গে এসেছে মাত্র কেননা; মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে আকর্ষণ এবং কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে আর এই কল্যাণ সাধনের প্রেক্ষাপটে আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"** অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভেতর কল্যাণ সাধন এবং হিত সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি (আ.) বলেন, **"এ প্রেক্ষাপটেই আমার উল্লেখ এসেছে মাত্র। মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মর্যাদা দিয়েছে।"** অতএব রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণের গন্ডিই হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-কে নিজের মাঝে বেষ্টিত করেছে আর এখন মহানবী (সা.)-এর উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকেরও উল্লেখ হলো।

এরপর তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **"হাজার বছরের অন্ধকার যুগের ফলে মুসলমানদের মাঝে যে নতুন নতুন বিশ্বাস এবং বিদআতের সূচনা হয়েছে তার সংশোধনই হলো উদ্দেশ্য।"** একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **"আমি পুনরায় বলছি, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যারা আসেন তারা কোন নিরর্থক কথা বলেন না। তারা শুধু এ কথাই বলেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর আর সৃষ্টির প্রতি সদ্ব্যবহার কর, নামায পড়, আর ধর্মে যেসব ভুল-ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো ছেড়ে দাও। আমি এখন প্রেরিত হয়েছি সেসব ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য যা বক্র যুগে দেখা দিয়েছে। মুসলমানদের মাঝে যে বক্র যুগ বা অন্ধকার যুগ এসেছে সেই যুগে এসব সৃষ্টি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো, আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপকে ধূলিস্মাৎ করা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত, গুরুত্বপূর্ণ আর সুমহান একত্ববাদের শিক্ষাকে সন্দেহযুক্ত করা হয়েছে। একদিকে খ্রিস্টানরা বলে, ঈসা (আ.) জীবিত আর আমাদের নবী (সা.) জীবিত নন আর এর ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ.)-কে খোদা এবং খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে কেননা; তিনি দু'হাজার বছর ধরে আকাশে জীবিত আছেন। কালের কোন প্রভাব তার ওপর পড়ে নি। অপরদিকে মুসলমানরাও একথা মেনে নিয়েছে যে, ঈসা (আ.) নিঃসন্দেহে জীবিত আকাশে গিয়েছেন এবং দু'হাজার বছর ধরে সেভাবেই জীবিত আছেন। তার অবস্থা আর আকৃতি এবং প্রকৃতির মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি আর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমার হৃদয় কেঁপে উঠে যখন আমি একজন মুসলমান মৌলভীর মুখে একথা শুনি যে, মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন বা মারা গেছেন। জীবিত নবীকে মৃত রসূল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে বড় অসম্মান এবং অবমাননা ইসলামের আর কি হবে? কিন্তু এটি স্বয়ং মুসলমানদেরই ভ্রান্তি যারা পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক নতুন কথা সৃষ্টি করেছে। পবিত্র কুরআনে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই ভুল নিরসনের দায়িত্ব আমার জন্যই নির্ধারিত ছিল কেননা; আমার নাম আল্লাহ্ তা'লা 'হাকাম' রেখেছেন। যিনি সিদ্ধান্তের জন্য আসবেন তিনি এই ভ্রান্তি দূরীভূত করবেন। পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং জোরালো আক্রমন সমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। এমন কথাবার্তা পৃথিবীর ভয়াবহ ক্ষতি করেছে।"** তিনি (আ.) বলেন, "এখন এসব মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময় এসে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা যাকে 'হাকাম' ন্যায় বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন তার সামনে এসব কথা গোপন থাকতে পারে না। দাই এর সামনে পেট গোপন থাকতে পারে না। কুরআন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, শেষ খলীফা মসীহ্ মওউদ হবেন আর তিনি এসে গেছেন। এখনো যদি কেউ বক্রযুগের গতানুগতিক ধ্যান-ধারনার অন্ধ অনুকরণ করে তাহলে সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করবে না বরং ইসলামের জন্যও ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হবে। আর সত্যিকার অর্থে এই ভ্রান্ত এবং অপবিত্র বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে মুরতাদ করেছে। এই নীতি ইসলামের চরম অসম্মান এবং অবমাননা করেছে আর মুহাম্মদ (সা.)-এরও অসম্মান করেছে

যখন তারা এই বিশ্বাস করে বসলো যে, ঈসা (আ.)ই মৃতদের জীবনদানকারী, আকাশে আরোহনকারী এবং শেষ ন্যায় বিচারক, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সেখানে আমাদের নবী করীম (সা.) তো নাঊযুবিল্লাহ্ কিছুই প্রমাণিত হলেন না অথচ তাকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। আর তিনি 'কাফফাতাল লিন্নাস' অর্থাৎ সমগ্র মানবতার জন্য রসূল হিসেবে এসেছেন। তিনিই হলেন খাতামান্নাবিঈন। যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন ভ্রান্ত ও বাজে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের আরেকটি বিশ্বাস হলো, এখন যত পাখি রয়েছে তাদের কিছু ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আর কিছু আল্লাহ্ তা'লার, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যালেক। আমি একবার এক একত্ববাদী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলাম, এখন যদি দু'টো প্রাণীকে পেশ করা হয় আর জিজ্ঞেস করা হয়, কোনটি আল্লাহ্র আর কোনটি ঈসা (আ.)-এর ? তখন সে উত্তরে বলে, এগুলো এখন কনফিউজিং বা সন্দেহপূর্ণ, এটি এখন ঘোলাটে হয়ে গেছে বা গুলিয়ে গেছে, স্পষ্ট করে বলা কঠিন যে, কোনটি কার।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি এবং কিছু ঘটনা উপস্থাপন করবো যাতে তার পবিত্র জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠে আর তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তার মনিব এবং অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এবং মাকামকে শুধু জ্ঞানগত বা যৌক্তিক দিক থেকেই প্রমাণ করেই ক্ষ্যান্ত দেননি বরং তাঁর শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষারও ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটে।

একবার আব্দুল হক নামী এক যুবক যে কলেজের ছাত্র ছিল এবং পূর্বে মুসলমান ছিল আর পরে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়; যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, অনেকেই ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, এ ব্যক্তিও তাদেরই একজন ছিল। সত্য সন্ধানে বা এমনিতেই উৎসুক্য-বশতঃ বা গবেষণার জন্য সে কাদিয়ান আসে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কিছুদিন অবস্থান করে। বিভিন্ন মুলাকাতে তিনি (আ.) তার সামনে বিভিন্ন মসলা-মসায়েল বর্ণনা করতেন। একবার সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলে, একজন খ্রিষ্টানের সামনে আপনার নাম নেয়া হলে সে আপনাকে গালি দেয়। সেই যুবক বলে, আমার কাছে এটি খুবই খারাপ লাগে। একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে উত্তর দিয়েছেন তা মূলতঃ তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ। তিনি (আ.) বলেন, **"গালি যে দেয় আমি আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না, গালিতে পরিপূর্ণ অনেক চিঠি-পত্র আসে যার মাশুল দিয়ে আমাকে সেই চিঠি নিতে হয় আর খুললে তা গালি-গালাজে পরিপূর্ণ দেখি, এছাড়া বিজ্ঞাপনেও গালি দেয়া হয়।** আজকালও একই অবস্থা, পাকিস্তানে (গালমন্দ সম্বলিত) বড় বড় বিজ্ঞাপন লাগানো হয়। **আর এখন তো খোলা খামে গালি লিখে পাঠানো হয়ে হয়, তাই এসব কথায় কি-ইবা যায় আসে। আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি কোনভাবে নির্বাপিত হতে পারে কি? সব সময় নবী এবং পুণ্যবানদের সাথে অকৃতজ্ঞরা এই ব্যবহারই করেছে। অর্থাৎ ঈসা (আ.), যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এসেছি, তাঁর সাথে কী ব্যবহার করা হয়েছে ? এই ব্যক্তি যেহেতু খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তাই তার সামনে তিনি (আ.) ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, তাকেও গালি দেয়া হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে আর ক্রুশবিদ্ধও করা হয়েছে।"** পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সাথে হেন**

দুর্ব্যবহার নেই যা করা হয়নি। আজ পর্যন্ত নোংরা প্রকৃতির মানুষ তাঁকে গালি দেয়, আমি মানব জাতির সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী, যে আমাকে শত্রু মনে করে সে নিজ প্রাণেরই শত্রু।

যেমনটি আমি বলেছি, আব্দুল হক নামের এই ব্যক্তির সাথে বেশ কয়েকদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আলোচনা চলতে থাকে, আর তিনি (আ.) তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, আমি আপনাকে বারংবার একথাই বলব যে, যতদিন কোন কথা আপনি পুরোপুরি না বুঝবেন ততদিন তা বার বার জিজ্ঞেস করুন। এমনটি ভাল নয় যে, একটি কথাতো বুঝলেন না অথচ না বুঝেই বলে বসবেন যে, হ্যাঁ, আমি বুঝে গেছি, এর ফলাফল ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এটি তাঁর বড় মনের পরিচায়ক, তিনি (আ.) বলেন, বারবার জিজ্ঞেস করবে। তাঁর মাঝে এক উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ছিল যে, মানুষের সামনে সত্য স্পষ্ট হবে আর তারা তা গ্রহণ করবে। এই যুবক সিরাজ উদ্দীন খ্রিষ্টানকেও জানত, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করেছিল, মসীহ্ মওউদ (আ.) তার উত্তরও দিয়েছেন, যা পরে পুস্তিকাকারেও ছাপা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

সিরাজ উদ্দীন, যে এখানে এসেছে, সে এমনই করেছে, সে প্রশ্ন করত আর নিরব থাকত আর উত্তরের পর প্রশ্ন করত না। এখানে এসেও তার কোন লাভ হয় নি। প্রতিটি কথায় সে ইতিবাচক সায় দিত আর পূতঃপবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে তার হৃদয়ে যে সন্দেহ ছিল বা যেই সন্দেহ দানা বেধে ছিল তা দূরীভূত করার চেষ্টা করেনি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আর অতিরিক্ত প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেনি। যা লিখে নিয়ে এসেছে তাই জিজ্ঞেস করেছে। বা মসীহ্ মওউদ (আ.) যা উত্তর দেন সেগুলো শুনে হ্যা, হ্যা করে বা ইতিবাচক সায় দিতে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আব্দুল হককে বলেন, সিরাজ উদ্দীন কি আপনাকে কিছু বলেছে? আব্দুল হক নামের সেই ব্যক্তি উত্তরে বলে, হ্যা, সে আমাকে এখানে আসতে বারণ করে যে, সেখানে যেয়ো না, কোন প্রয়োজন নেই। আমরা সত্য পেয়ে গেছি, অর্থাৎ সেও ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ সে বলে যে, আমরা সত্য পেয়ে গেছি, অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছি তাই আর গবেষণার প্রয়োজন কি? আর সে এ কথাও বলেছিল যে, আমি যখন কাদিয়ান যাই আমাকে বিদায় জানানোর জন্য তিনি (আ.) তিন মাইল পর্যন্ত সঙ্গে আসেন এবং ঘর্মাক্ত হয়ে যান, অর্থাৎ সেই সিরাজ উদ্দীনকে বিদায় দেয়ার জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) তিন মাইল পর্যন্ত তার সাথে যান। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উন্নত আতিথেয়তা এবং মহান ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। বদর পত্রিকার সম্পাদক এই প্রেক্ষাপটে যেই নোট লিখেছেন তাহলো, সুস্থ প্রকৃতির মানুষের মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ এবং সহানুভূতি সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত। তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান সেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের ধারণা নেয়া উচিত যা তাঁর ফিতরত এবং তাঁর প্রকৃতিতে একটি প্রাণ রক্ষার জন্য ছিল। তিন মাইল পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া এটি কি কেবল সহানুভূতির বশবর্তী হয়েই ছিল না? অবশ্যই সহানুভূতির বশবর্তী হয়েই তাকে রক্ষা করার জন্য করেছেন নতুবা মিঞাঁ সিরাজ উদ্দীনের সাথে তার কিইবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল? কেউ যদি সুস্থ প্রকৃতির হয় তাহলে তাঁর (আ.) সহানুভূতির এই যে প্রেরণা তা দেখেই সে হিদায়াত পেতে পারে। হে সেই ব্যক্তি! যার

মাঝে আমাদের জন্য সত্যিকার আন্তরিকতা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস বিরাজমান তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে শান্তির বরপুত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সে যে ঘামের কথা বলেছে তার অর্থ হলো, আমরা যেন উত্তর দিতে পারি নি। পরিতাপ! আপনার তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, সে এখানে অবস্থানকালে নামায কেন পড়ত? সে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে তখন সে নামাযও পড়ত। তিনি (আ.) বলেন, সে কি এ কথা বলেনি যে, আমার সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে? আমার সামনে থাকলে আমি কসম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতাম, আর সামনে থাকলে তার কিছুটা হলেও লজ্জা হতো। আব্দুল হক বলে, আমি নামাযের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলে যে, হ্যা, নামায পড়তাম আর সিরাজ উদ্দীন বলে, আমি বলেছিলাম কোন ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত করব। খ্রিষ্টান সিরাজ উদ্দীন এ কথাও বলেছিল যে, মির্যা সাহেব খ্যাতি-প্রিয়। আমি চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম সেই চারটি প্রশ্নের উত্তর তিনি ছাপিয়ে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এতে খ্যাতি-প্রিয়তার কি আছে, আমি সত্য কেন গোপন করব। সত্য গোপন করলে আমরা গুনাহ্গার গণ্য হতাম আর পাপ হতো। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আমাকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে পাঠিয়েছেন সেখানে আমি অবশ্যই সত্য প্রকাশ করব আর যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা সৃষ্টির কর্ণগোচর করব। আমি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করি না যে, কেউ আমাকে খ্যাতি-সন্ধানী বা অন্য কিছু বলবে। আপনি তাকে চিঠি লিখুন, সে যেন আরো কিছু দিন এখানে এসে অবস্থান করে।

অতএব যে কাজের প্রতি বা যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন সেই কাজকে শুধু এক ব্যক্তি পর্যন্ত তিনি সীমাবদ্ধ রাখেন নি বরং তিনি (আ.) নিশ্চিত ছিলেন, এর ফলে অন্যদেরও উপকার হতে পারে এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র সুস্পষ্ট হতে পারে, তাই তিনি এই উত্তর ছাপিয়ে দেন, কোন নাম বা জশ বা খ্যাতির জন্য তিনি এমনটি করেন নি। তাঁর প্রতিটি কাজ ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল।

যাহোক, এই যুবক আব্দুল হকের সাথে ভ্রমণকালে তাঁর অনেক কথা হতো। একদিন সিরাজ উদ্দীন সংক্রান্ত কথা-বার্তা বা আলোচনা করতে করতে তিনি (আ.) ঘরের কাছে পৌঁছে আব্দুল হককে সম্বোধন করে বলেন, আপনি আমাদের অতিথি। কেবল সেই অতিথিই আরাম পেতে পারে যে কৃত্রিমতা মুক্ত। অতএব আপনার যেই জিনিসের প্রয়োজন হবে অকৃত্রিমভাবে আমাকে জানাবেন। এরপর জামাতকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, দেখ! ইনি আমাদের অতিথি, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হবে তার সাথে একান্ত উন্নত ব্যবহার করা। আর চেষ্টা করা উচিত যেন তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়, একথা বলে তিনি ঘরের ভেতরে চলে যান। প্রত্যেক ব্যক্তির আতিথেয়তার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি যত্নবান থাকতেন। কেউ সত্য-সন্ধানের জন্য আসলে প্রধানতঃ তিনি নিশ্চিত করতেন যেন সঠিক পয়গাম তার কর্ণগোচর হয় আর জাগতিক এবং বাহ্যিক আরাম এবং সুযোগ-সুবিধাও সে যেন পায়।

একজন রোগীকে দেখার বা দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনা আমি তুলে ধরব, এতে বোঝা যায় যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার প্রেক্ষাপটে অধুনা কালের পীর-ফকিরদের মত কোন

বড়াই করেন নি যে, আমি দোয়া করব বা আমার দোয়া গৃহীত হয় বরং খোদার একত্ববাদ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার দর্শন এবং নিজের অবস্থাকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত করার কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। ঘটনার লেখক লিখছেন, ঘটনা হল, কোরাইশী সাহেব বেশ কয়েকদিন থেকে অসুস্থ হয়ে দারুল আমানে হযরত হাকীমুল উম্মত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এসেছেন, তিনি বেশ কয়েকবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার আকুতি করেন। তিনি (আ.) বলেন, আমরা দোয়া করব। এরপর একদিন সন্ধ্যার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মাধ্যমে তিনি নিবেদন করেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যিয়ারতের সম্মান পেতে চাই কিন্তু পা ফুলে যাওয়ার কারণে আমি আসতে পারব না বা যেতে পারছি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং ১১ই আগষ্ট তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসার প্রতিশ্রুতি দেন।প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য বের হতেই খোদ্দাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি সেই ঘরে পৌঁছেন যেখানে এই ইনি অবস্থান করছিলেন আর রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজ-খবর নেন, এরপর তবলীগ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন (তবলীগের কোন সুযোগ তিনি হেলায় নষ্ট করতেন না, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন) আমি তোমার পয়গাম পেয়ে দোয়া করেছি, কিন্তু আসল কথা হলো নিছক দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ খোদার ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত না আসবে। অভাবীদের কতই না কষ্ট হয় কিন্তু শাসকের পক্ষ থেকে একটু বললেই আর মনোযোগ দিলেই সেই কষ্ট দূর হয়ে যায়। যাদের বিভিন্ন অভাব অনটন রয়েছে আর এর সুরাহার জন্য তারা শাসকের কাছে যায় এবং তাদের কৃপাদৃষ্টিতে তা দূরীভূত হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সব কিছু সাধিত হয়। দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি আমি তখন অনুভব করি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসে বা নির্দেশ আসে তিনি বলেছেন, ادْعُونِ। কিন্তু একই সাথে أَسْتَجِبْ لَكُمْ -ও রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, দোয়া কর আর দোয়া গ্রহণও আমিই করব অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত হলেই দোয়া গৃহীত হবে। আর এর জন্য আল্লাহ্‌র কথা মানা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হলো শর্ত। তিনি (আ.) বলেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বান্দার নিজের অবস্থায় এক পবিত্র পরিবর্তন আনা আর অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহ্‌র সাথে মিমাংসা করা। তার এটি জানা থাকা দরকার যে, পৃথিবীতে সে কোন উদ্দেশ্যে এসেছে আর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতটা চেষ্টা করেছে। মানুষ যতক্ষণ খোদা তা'লাকে চরম অসন্তুষ্ট না করে ততক্ষণ কোন কষ্টে নিপতিত হয় না কিন্তু মানুষ যদি নিজের মাঝে পরিবর্তন আনে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও করুণার সাথে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আর ডাক্তার সঠিক ঔষধ সম্পর্কে নিশ্চিৎ হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা করুণার সাথে দৃষ্টিপাত করলেই ডাক্তারকে সঠিকভাবে তার রোগ নির্ণয় করার জ্ঞান দান করেন। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র জন্য কিছুই কঠিন নয় বরং তাঁর পবিত্র মহিমা হলো, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (সূরা ইয়াসীন: ৮৩) অর্থাৎ তাঁর নির্দেশই যথেষ্ট, তিনি যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন যে, হয়ে যাও আর তা হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, একবার পত্রিকায় পড়েছিলাম, একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর পেন্সিল দ্বারা নখের ময়লা বের করছিল, এরফলে তার হাত ফুলে যায় আর ডাক্তার তখন হাত কাটার পরামর্শ

দেয়, সে এটিকে তুচ্ছ বিষয় জ্ঞান করে, ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, সে মারা যায়। অনুরূপভাবে একদিন আমি লেখার জন্য নখ দিয়ে পেন্সিল প্রস্তুত করি দ্বিতীয় দিন যখন ভ্রমণে বের হই তখন এই ডেপুটি ইন্সপেক্টরের কথা মাথায় আসে আর একই সাথে আমারও হাত ফুলে যায়। আমি তখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি আর ইলহাম হয়। তাকিয়ে দেখি আমার হাত পুরোপুরি সুস্থ, কোথায় কোন ফোলা ছিল না বা কষ্ট বাকি ছিল না। বস্তুতঃ আসল কথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা যখন কৃপা করেন তখন আর কোন কষ্ট অবশিষ্ট থাকে না। আর এর জন্য শর্ত হলো, মানুষের নিজের মাঝে পরিবর্তন আনা। এরপর যাকে তিনি দেখেন যে, এই ব্যক্তি কল্যাণকর এক সত্তা, আল্লাহ্ তা'লা তখন তার আয়ু দীর্ঘায়িত করেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, তার জীবন কল্যাণকর, এরফলে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘজীবি করেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার এমনটিই হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের পুস্তকে এ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে লেখা রয়েছে যে,

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (সূরা আর রা'দ: ১৮) অর্থাৎ যা মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে তা পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী হয় বা পৃথিবীতে এর অবস্থান দীর্ঘ হয়। وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী থেকেও এটি প্রমাণিত হয়। হিজকিল নবীর পুস্তকেও এটি উল্লেখ আছে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ অনেক মহান কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছে কিন্তু যখন সময় ঘনিয়ে আসে আর তার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে মৃত্যু দেন। সেবক বা ভৃত্যকেই দেখ, সে যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে তার মনিব তাকে ছুটি দিয়ে দেয় বা বিদায় দিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে কেন জীবিত রাখবেন যে নিজের দায়িত্ব পালন করে না।

তিনি বলেন, আমাদের মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মরহুম পিতা পঞ্চাশ পর্যন্ত হেকিমী চিকিৎসা করেছেন। অথচ তার উক্তি হলো, তিনি কোন কার্যকর হেকিমী ব্যবস্থাপত্র পাননি। আসল কথা হলো, প্রতিটি বিন্দু যা মানুষের দেহে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন কাজে আসতে পারে না। তাই অনেক বেশি তওবা এবং ইস্তেগফার করা উচিত যেন খোদার কৃপা হয়। আল্লাহ্‌র কৃপাবারি যখন বর্ষিত হয় তখন দোয়াও গৃহীত হয়। আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, **দোয়া গ্রহণ করব**। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একথাও বলেছেন যে, আমার তকদীরকে শিরোধার্য কর, তাই যতক্ষণ খোদার সিদ্ধান্ত না হয় দোয়া গৃহীত হওয়ার আশা আমি কমই রাখি। বান্দা খুবই দুর্বল এবং অসহায়, তাই খোদার কৃপাবারির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। এরপর তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকারের প্রতিও সত্যিকার ইসলামের শিক্ষার আলোকে পথের দিশা দিয়েছেন আর সেভাবে স্বীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যেভাবে তিনি তাঁর মনিব এবং অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লার অধিকারগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো, তাঁর ইবাদত করা, আর এই ইবাদত যেন কোন ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রীক যেন না হয় বরং জান্নাত,**

দোযখ না থাকলেও তাঁর ইবাদত করা উচিত। আর সেই ব্যক্তিগত ভালোবাসা যা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির থাকা উচিত তাতে যেন বিন্দুমাত্র তারতম্য না ঘটে। আজকাল মানুষ বিশেষতঃ ধর্মের বিরোধিরা অনেক আপত্তি করে যে, তোমরা তো লোভ লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ইবাদত কর। তিনি (আ.) বলেন, **খোদাপ্রেমের বশবর্তী হয়ে এবং তাঁর ভালোবাসার কারণে তাঁর ইবাদত করা উচিত।** তাই এসব অধিকারের ক্ষেত্রে জান্নাত, দোযখের প্রশ্ন আসা উচিত নয়, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় যে, আমি জান্নাত পাব, না দোযখ? বরং খোদার সাথে যেই ভালোবাসা আছে সেই ভালোবাসার দাবি হলো, তাঁর ইবাদত করা, খোদার কৃপার দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা। তিনি (আ.) বলেন, **"মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমার ধর্ম বা আমার রীতি হলো, যতক্ষণ শত্রুর জন্য দোয়া না করা হবে পুরোপুরি বক্ষ পরিস্কার হয় না।** ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা মোমেন: ৬১) **এতে আল্লাহ্ তা'লা কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন নি যে, শত্রুর জন্য দোয়া করলে আমি তা গ্রহণ করব না বরং আমার ধর্ম হলো, শত্রুর জন্য দোয়া করাও মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি। হযরত উমর (রা.) এ কারণেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর জন্য প্রায়শঃ দোয়া করতেন। তাই কার্পণ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করা উচিত নয় আর কারো জন্য ক্ষতিকর হওয়া উচিত নয়। কৃতজ্ঞতার বিষয় হলো, আমাদের এমন কোন শত্রু নেই যার জন্য অন্তত দু'তিনবার দোয়া করিনি, একজনও এমন নেই। তাই তোমাদেরকেও আমি একথাই বলব, আর এটিই তোমাদের শিখাচ্ছি। কাউকে শুধু কষ্ট দেয়ার খাতিরে কষ্ট দেয়া আর কার্পণ্যবশতঃ তার প্রতি অন্যায় শত্রুতা পোষণে খোদা তা'লা ততটাই অসন্তুষ্ট হন যেভাবে তিনি এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক বা সমকক্ষ করা হবে।** যেভাবে তিনি তার সাথে কাউকে শরীক করাকে ঘৃণা করেন তেমনই কারো প্রতি অন্যায় শত্রুতাকেও খোদা তা'লা চরম ঘৃণা করেন। তিনি (আ.) বলেন, **এক জায়গায় তিনি 'ফাসাল' চান না আরেক জায়গায় তিনি 'ওয়াসাল' চান না। অর্থাৎ এক জায়গায় তিনি দূরত্ব চান না আর এক জায়গায় তিনি মিলিত হতে চান না বা সেই মাকাম চান না যা মিলিত হওয়ার স্থান।** তিনি (আ.) বলেন, অর্থাৎ মানব জাতির পরস্পর বিচ্ছেদ আর অপর দিকে কারে তাঁর সাথে একাকার হওয়া। মানব জাতি পরস্পর ঝগড়া করবে, বিবাদ করবে, নৈরাজ্যে লিপ্ত হবে, একজনের মুখ থাকবে এক দিকে অপরজনের ভিন্ন দিকে এটিকে বলা হয় 'ফাসাল" এটি খোদা তা'লা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে কাউকে যুক্ত করা বা মেলানো, তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করানো, তাঁর শরীক আখ্যায়ীত করাকে বলা হয় 'ওয়াসাল', আল্লাহ্ তা'লা এটি পছন্দ করেন না। তিনি চান না যে, মানুষ পরস্পরকে পরিত্যাগ করুক। আল্লাহ্ তা'লা চান তারা যেন মিলে মিশে থাকে, প্রেম ভালোবাসার বন্ধনে তারা জীবন যাপন করুক। তারা যেন পরস্পরকে একে অন্যের সমান মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এক এবং অনন্যতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ চান না তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হোক। রীতি হলো, অস্বীকারককারীদের জন্য দোয়া করা, এরফলে বক্ষ পরিস্কার হয় এবং বক্ষ উন্মোচিত হয়, মনোবল দৃঢ় হয়। তাই যতদিন আমাদের জামাত এই রীতি অবলম্বন না করবে তাদের এবং

অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। আমার মতে যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সাথে ধর্মের খাতিরে বন্ধুত্ব করে, তার উচিত আত্মীয়স্বজনের মাঝে যে পদমর্যাদায় খাটো তার সাথেও অত্যন্ত কোমল এবং নমনীয় আচরণ করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা কেননা; খোদার মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা হলো, তিনি পাপিদেরকেও পুণ্যবানদের সাথে ক্ষমা করেন।

অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমাদের উচিত এমন জাতিসত্তায় পরিণত হওয়া যে জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"ফাইন্নাহুম কাউমুন লা ইয়াশকা জালিসুহুম" অর্থাৎ তারা এমন এক জাতি যাদের সহাবস্থানকারীরা অর্থাৎ তাদের সাথে যারা বসে তারাও দুর্ভাগ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না। এটি সেসব শিক্ষার সার কথা যা "তাখাল্লাকু ফব আখলাকিল্লাহ্‌র' অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব এ হলো কয়েকটি কথা যা আমি বর্ণনা করেছি, সেই মহান ভান্ডার থেকে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে তুলে ধরেছেন। এথেকে থেকে প্রকাশিত হয় যে, তিনি (আ.)-ই রসূলে করীম (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষা অবলম্বন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খতমে নবুয়্যতের ধ্বনিই উত্তোলন করেন নি বা নারা উচ্চকিত করেন নি বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম তাঁর মনিব ও অনুসরণীয় নেতার আনুগত্যে ছিল। আর এই শিক্ষা এবং এই শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করার এক ব্যাকুলতা তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল যেন পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে যে, সেই আকর্ষণীয় শিক্ষা যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এটিই সত্যিকার মুক্তির উপায়, আর স্বীয় মান্যকারীদেরকেও তিনি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হওয়ার সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালনের তৌফিক দান করুন, এবং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ও সুন্নত অনুসারে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দানের পাশাপাশি মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং মাকামের সত্যিকার জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের দান করুন যেন আমরা ইসলামের সত্যিকার চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।